

অদম্য মেধাবী

হারতে জানে না ওরা

প্রথম আলো ডেস্ক

লেখাপড়ার খরচ চালাতে না পারায় বালিকা বয়সেই রূপা খাতুনকে বিয়ে দিয়েছিলেন গরিব বাবা। বিয়ের সময় যৌতুক না চাইলেও পরে বরের পরিবার থেকে দাবি করা হয় এক লাখ টাকা। না দিতে পারায় রূপাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাবার বাড়ি। কিছুদিন পর দেওয়া হয় তালুক। তবে ঘর ভাঙলেও মনোবল ভাঙেনি এই কিশোরী। পরের বছরই জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে তাক লাগিয়ে দেয়



রূপা খাতুন

খায়রুল্লাহ

মিজানুর রহমান

লিজা আক্তার

সে। এবার এসএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী বাগমারা উপজেলার চান্দেবড়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে সেই অদম্য মনোবলের স্বাক্ষর রেখেছে এই

চাঁদের টুকরা মেয়ে। কষ্টের জীবনে এমন সফলতার গল্প শুধু রূপার একার নয়, তার এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

হারতে জানে না ওরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মতোই দারিদ্র্যকে পাশ কাটিয়ে আঁধার ঘরে চাঁদের রূপালি আলোর আভা ছড়িয়েছে পিরোজপুরের খায়রুল্লাহর, রংপুরের তারাগঞ্জের মিজানুর রহমান ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের লিজা আক্তার। অদম্য এই মেধাবীদের কেউ ভয়ানক চালায়ে ও দিনমজুরি করে, কেউ এলাকাবাসীর অর্থসাহায্য নিয়ে, কেউবা শিশুদের পড়িয়ে নিজের পড়ালেখা চালিয়ে গেছে।

হার না মানা রূপা: বাগমারার চান্দেবড়া গ্রামের কৃষক আবুল কাশেমের মেয়ে রূপা। ২০১১ সালে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তার বিয়ে হয়। তালকের পরের বছরই চান্দেবড়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেলে ওই সময় প্রথম আলোয় সংবাদ প্রকাশিত হয়। তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনেকে এগিয়ে আসেন। ওই সময় রূপা কথা দিয়েছিল এসএসসিতেও ভালো ফল করবে। কথা রেখেছে সে। মানবিক বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে রূপা।

রূপা প্রথম আলোকে বলে, সে অতীতের সবকিছু ভুলে গেছে। এখন উচ্চমাধ্যমিকে ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে আরও ভালো ফল করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছা তাঁর। তবে বাবার সাংসারিক অবস্থা নিয়ে সে চিন্তিত।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুস সাত্তার জানান, সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশ পেলে সে আরও ভালো করবে। বিদ্যালয় থেকে এবার মাত্র দুজন জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে তার একজন।

রূপার বাবা আবুল কাশেম বলেন, তিনি দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পাঁচ ছেলেমেয়ের সংসারে অভাব লেগে থাকার কারণে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ভুল করেছিলেন।

প্রাইভেট না পড়ে পড়িয়েছে খায়রুল্লাহর: চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় ২০০৯ সালে মারা যান খায়রুল্লাহর বাবা মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জেল হোসেন। তিনি ছিলেন সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বাড়ি কাউখালী উপজেলা শহরের দক্ষিণ বাজার এলাকায়। তিন শতক জমিতে ভাঙাচোরা টিনের ঘর ছাড়া পরিবারটির আর কোনো সম্পদ ছিল না। স্কুলপড়ার দুটি ছোট মেয়েকে নিয়ে মা সাহিদা বেগম চোখে অন্ধকার

দেখছিলেন। বাসা-বাড়িতে বিয়ের কাজ করে এবং শিশুদের কোরআন পড়িয়ে সংসার চালাতো শুরু করেন তিনি। এই আয়ে সংসার চলছিল না। তাই নবম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় প্রাইভেট পড়ানো শুরু করে খায়রুল্লাহর। এবার পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার এসবি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে সে। পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুল ও অষ্টম শ্রেণিতেও সাধারণ বৃত্তি পেয়েছিল সে।

খায়রুল্লাহর মা সাহিদা বেগম প্রথম আলোকে বলেন, 'মেয়েদের সব সময় খেতে দিতে পারিনি। খায়রুল্লাহর ছোটবেলা থেকেই মেধাবী। আজ (বুধবার) মেয়েটির ফল ঘোষণা হলো। সে এ প্লাস পেল। ওর সহপাঠীরা সবাই আনন্দ করছে, অথচ সে প্রাইভেট পড়াতে গেছে। ঘরের চাল দিয়ে বর্ষায় পানি পড়ে। টাকার অভাবে মেরামত করতে পারছি না। বলতে বলতে চোখের পানি আটকান তিনি।

খায়রুল্লাহ বলে, 'মা কষ্ট করে আমাদের মানুষ করেছে। আমরা দুই বোন প্রাইভেট পড়িয়ে পড়াশোনার খরচ চালিয়েছি। আমি ভবিষ্যতে কম্পিউটার প্রকৌশলী হতে চাই। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও দরিদ্র মেয়েদের লেখাপড়া নিয়েও কাজ করার ইচ্ছা আছে।

এসবি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মেয়েটি যাতে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে, সে জন্য সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসা উচিত।

যে ঘরে ছাগল, সে ঘরেই মিজানুরের পড়াশোনা: রংপুরের

তারাগঞ্জ উপজেলার বুড়ি হাট গ্রামে অন্যের জমিতে ছোট একটা দোচালা টিনের ঘর। নড়বড়ে ওই ঘরে চার ভাইবোন, বাবা ও সৎমায়ের সঙ্গে তাঁই হয় না মিজানুর রহমানের। তাই রাতে প্রতিবেশী ছাত্রের হোসেনের বাড়িতে থাকে সে। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাবার ঘরটির এক পাশে ছাগল, অন্য পাশে মিজানুরের ছোট পড়ার টেবিল। সেখানে লেখাপড়া করে সে। তারাগঞ্জের বুড়িহাট উচ্চবিদ্যালয় থেকে সে এবার বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে। তাঁর বাবা হাকিমউদ্দিন কখনো ভাড়াই ভ্যান চালান, কখনো দিনমজুরি করেন। সৎমা মোস্তাকিনা গ্রামের এ বাড়ি-ও বাড়ি কাজ করেন। বাবা দিনমজুরি করতে গেলে মিজানুর ভ্যান চালায়। বাবার সঙ্গে কৃষিকাজের দিনমজুরিও করে সে।

মিজানুর প্রথম আলোকে জানায়, 'ঋণ করে পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছিলাম। মানুষের বাড়িতে কাজ করে সেই টাকা শোধ করেছি। টাকার অভাবে প্রাইভেট পড়তে পারিনি। প্রায় দিনই না খেয়ে স্কুলে যেতে হয়েছে। বলতে বলতে দুই চোখ ভিজে ওঠে তার।

বুড়িহাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম বলেন, 'অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে মেধাবী হওয়ায় মিজানুরের স্কুলের বেতন নেওয়া হয়নি। একটু সহযোগিতা পেলে সে তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে।

পরের সাহায্য নিয়ে আলো ছড়াল লিজা: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দশদানা গ্রামের আবুল

হাসেমের মেয়ে লিজা আক্তার বাঞ্ছারামপুর বালিকা পাইলট উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে। ২০১০ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে এবং ২০১৩ সালে অষ্টম শ্রেণিতে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছিল সে। তার স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া। তবে দারিদ্র্যের কারণে স্বপ্ন ফিকে হওয়ার আশঙ্কা করছে সে।

লিজার বাবা ঢাকায় বাবুটির কাজ করেন। তাঁর অল্প আয়ে সাত সদস্যের পরিবার চলে কোনো রকমে। 'তাই এলাকাবাসীর সহযোগিতায় লেখাপড়ার খরচ চলে লিজার।

লিজা আক্তার প্রথম আলোকে বলে, 'আমি ডাক্তার হতে চাই। টিউশনি করে হলেও আমি ভালো কলেজে পড়তে চাই।

বাবা আবুল হাসেম বলেন, 'মাইয়ার পড়ালেখা বন্ধ কইরা দিতে চাইছিলাম। মানুষের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত পড়াইছি। মেয়ে চায় ভালো কলেজে পড়ালেখা করতে। আমার আয় দিয়া সেটা সম্ভব অবৈব না।

বাঞ্ছারামপুর বালিকা পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, লিজা খুবই মেধাবী ছাত্রী। কিন্তু দারিদ্র্য তার সামনে যাওয়ার পথে অন্তরায়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি লিজার পাশে না দাঁড়ায়, তার মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে না।

{প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহায়তা করেছেন পিরোজপুর, বাগমারা (রাজশাহী), তারাগঞ্জ (রংপুর) ও বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি}